মহাপ্রভুর অন্তর্ধাণ লীলা

শ্রী মনোরঞ্জন দে

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলা

শ্রী মনোরঞ্জন দে

সূর্যোদয়

উৎসর্গ

পরম পূজ্যপাদ—

শ্রীল সুভগ স্বামী মহারাজ-এর

করকমলে

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই বইটির এই সংস্করণ ছাপানোর জন্য অর্থানুকূল্য করেছেন ভক্তপ্রবর শ্রী রাধাগোবিন্দ সাহা এবং শ্রীমতি সুনীতা সাহা, ৫২ বি. কে. দাস রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা। তারা অবশ্যই সপরিবারে শ্রী গৌরহরির কৃপা লাভ করবেন নিঃসন্দেহে।

লেখকের বইসমূহ

১. বৈষ্ণব সম্প্রদায়
২. বৈষ্ণব নামধারী অপ-সম্প্রদায়
৩. দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টী মহান্ত
৪. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলা
৫. শ্রী শ্রী রাধা তত্ত্ব
৬. শ্রী নৃসিংহদেব

পরবর্তী বই

মহাপ্রভুর বাল্যলীলা
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র
বৈষ্ণব প্রদীপ
(বৈষ্ণব ধর্মের দুই হাজার প্রশ্নের উত্তর)

লেখকের নিবেদন

প্রথমেই আমার পরমারাধ্য গুরুদেব কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্ত্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-এর শ্রীচরণ কমলে শত কোটি দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করছি।

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীন্ ইতি নামিনে ॥
নমস্তে সারস্বতে দেবং গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥

সাধারণ মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের আবির্ভাব বা জন্মলীলা সম্পর্কেই জানতে বেশি আগ্রহী হন। তাঁর তিরোভাব বা সংগোপন লীলা সম্পর্কে শাস্ত্রে আলোচনা তেমন একটা নেই বললেই চলে। থাকার প্রয়োজনই বা কি? এরপরও কিছু পাষণ্ডী এবং পণ্ডিত নামধারী কিছু লোক অহেতুক তথাকথিত গবেষণার নামে শ্রী ভগবানের তিরোভাব সম্পর্কে অপ্রামাণিক বই-পুস্তকের ভিত্তিতে নিজেদের মনোকল্পিত কিছু আলোচনা করার দুঃসাহস দেখান। আর এই করতে গিয়ে নিজেদের ভগবৎবিদ্বেষী চরিত্রই প্রকারান্তরে ব্যক্ত করে ফেলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রী গৌরহরির তিরোভাব সম্পর্কেও এই রকম আলোচনা-সমালোচনা দেখতে পাওয়া যায়।

আমার এখনও মনে আছে, প্রায় ২০ বছর আগে চাঁদপুর জেলার কোন এক স্থানে এক ধর্মীয় সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত

ছিলাম। ধর্মসভায় আগত বাংলার একজন অধ্যাপক একসময় কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডারা খুন-গুম করে সেই মন্দিরেই সমাধিস্থ করে রাখেন এবং প্রচার করেন যে তিনি শ্রী জগন্নাথদেবের দেহে লীন হয়ে গিয়েছেন। কি জঘন্য অপবাদ! মনে করলেও অনন্তকাল নরকে থাকতে হবে। এই ধরনের তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে থাকেন। এই ধরনের আরও অপপ্রচার প্রচলিত আছে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে গৌরভক্তবৃন্দ যাতে কোন বিভ্রান্ত না হন সেজন্যই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

উল্লেখ্য যে, এই বইটি আমার সৃষ্ট কিছু নয়। বিভিন্ন উৎস থেকে ক্ষেত্রবিশেষে হুবহু তথ্য তুলে ধরেছি। তাই এই বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও অবদান নেই। প্রকৃত গৌড়ীয় ভক্তরা এ বই থেকে উপকৃত হলেই এই শুদ্রাধম কৃতকৃতার্থ হবে।

যেসব গৌড়িয় ভক্ত এই দীন-অভাজনকে এই বইটি সংকলন ক রতে কৃপাশীর্বাদ করেছেন তাদের মধ্যে শ্রীপাদ পদ্মনাভ মহারাজ, ভাগবত প্রবর শ্রী প্রেমরতন গোস্বামী, ভক্তপ্রবর শ্রী দীপক দেবনাথ, ভাগবত প্রবর শ্রী দীপক গুপ্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাল, ভক্তপ্রবর শ্রী জয় দেবনাথ, ভক্তপ্রবর শ্রী চন্দন পোদ্দার, ভক্তপ্রবর শ্রী সুবীর পাল এবং ভক্তপ্রবর শ্রী সঞ্জয় মোদক অন্যতম। এছাড়া এই বই সংকলনের জন্য উৎসাহিত করায় শ্রী নৃসিংহ মন্দিরের সেবক শ্রী চিদানন্দ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের সেবক শ্রী মথুরাদাস প্রভু এবং শ্রী শ্রী রাধাবঙ্কুবিহারী মন্দিরের সেবকদ্বয় শ্রীমান নিমাই প্রভু এবং শ্রী অনন্ত প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
মনোরঞ্জন দে

সূচিপত্র

১.১ পরমেশ্বর ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব

ভগবান সব স্থানে, সব কালে এবং সব লোকের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না। যোগমায়ার আবরণে নিজেকে বিমুখ জীবের কাছে সঙ্গোপন রাখেন। আসলে ভগবানের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। তিনি অব্যয়, অক্ষয়, শাশ্বত এবং চিরন্তন। তিনি সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় বিগ্রহ। কিন্তু মূঢ়গণ তা জানতে এবং দেখতে পায় না। তাই ভগবান নিজেই বলেছেন—

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম ॥

(গীতা ৭/১২)

সর্ব্বশক্তিমান ভগবান তাঁর আবির্ভাব শক্তি দ্বারাই জগতে প্রকট হন। আবার তাঁর অন্তর্ধান শক্তির সাহায্যেই এই জগত থেকে অপ্রকট হন। তাঁর প্রকটকেই আবির্ভাব এবং অপ্রকটকে তিরোভাব বলা হয়। বৈষ্ণব মহাজন শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় এই দুই শক্তির কথাই তাঁর শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন—

"এইসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব, তিরোভাব–এই কহে বেদ ॥"

শ্রী ভগবান সর্বশক্তিমান। তাই তিনি সবার সামনে উপস্থিত হয়ে আবার ইচ্ছানুসারে সবার কাছেই অদৃশ্য হতে পারেন। আবার অন্তরঙ্গ ভক্তজনের কাছে গোচরীভূত হয়ে অন্যের কাছে সঙ্গোপনে থাকতে

পারেন। সবই লীলাময় ভগবানের শক্তি এবং ইচ্ছা। বৈষ্ণব-পদাবলী রচয়িতা শ্রী চণ্ডী দাস তাই বলেছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন
কেহ্ না দেখয়ে তাঁরে।
প্রেমের পীরিতি, যে জন জানয়ে,
সেই সে পাইতে পারে।"

অর্থাৎ পরম করুণাময় ভগবান কৃপা করে নিজেকে জানালেই জীব তাকে জানতে পারে। এই জন্যই শ্রীল কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীও তার শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলেছেন—

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে
সেইত' ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে।

(চৈ. চ. ২/৬/৮৩)

কাজেই পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা না ছাড়া তাঁকে জানা, বুঝা এবং তাঁর তত্ত্ব জানার কোন ক্ষমতাই জীবের নেই।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই জড় জগতে অবস্থানকালেই বেশ কয়েকবার তাঁর অন্তর্ধান লীলা প্রকাশ করেছিলেন। যেমন ভারতের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় কূর্ম্মাচলে কূর্ম্ম নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাত্রি বাস করে পরদিন ভোরে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করেন। ঐ সময় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত বাসুদেব বিপ্র নামে এক পরম ভক্ত গৌরহরির দর্শন লাভের আশায় সেখানে এসে উপস্থিত হন। কূর্ম্ম বিপ্রের কাছে প্রভুর বিদায় সংবাদ শুনে শিরে করাঘাত করে বাসুদেব বিপ্র করুণভাবে বিলাপ করতে থাকেন। ভক্ত বৎসল শ্রী গৌরহরি ভক্তের ক্রন্দনে স্থির থাকতে না পেরে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আবির্ভূত হন। বিপ্রকে আলিঙ্গন করে কুষ্ঠ ব্যাধি থেকে মুক্ত করে কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ দেন। এর পরই তিনি আবার অপ্রকট হয়ে যান।

"এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্ধান।
দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে।"

(চৈ. চ. ২/৭/১৪৯)

আবার দক্ষিণদেশ ভ্রমণের সময় এক পাষণ্ডী বৌদ্ধ আচার্য মহাপ্রভুকে বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজন করতে দেয়ায় সেই অপরাধে ভোজন পাত্রের আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তখন ঐ আচার্যের শিষ্যরা মহাপ্রভুর শরণাগত হয়। প্রভু তাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনের উপদেশ দেন। তারা সংকীর্ত্তনে রত হলে বৌদ্ধ আচার্য চেতনা ফিরে পান। মহাপ্রভুর প্রতি তার কৃষ্ণ-জ্ঞান উদয় হয় এবং অতি বিনীতভাবে প্রভুর স্তুতি করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেই ক্ষণেই প্রভু অন্তর্ধান করেন।

"কৃষ্ণ বলি আচার্য্য প্রভুরে করেন বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময় ॥
এইরূপ কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল, কেহ না পায় দর্শন ॥

(চৈ. চ. ২/৯/৬২-৬৩)

এইভাবে অন্তর্ধান লীলা প্রকাশ ভগবানের জন্য কোন বিশেষ ঘটনাই নয়। কেবল জীবজগতের কাছে তাঁর যোগমায়ারূপ যবনিকার পতন মাত্র। বদ্ধ জীবের কাছে ভগবান যে অদৃশ্য থাকেন, সেটিও তাঁর এক ধরনের সঙ্গোপন অবস্থাই। তাই ভক্তের কাছে ভগবানের নিত্যলীলা অনুভূত হয়। অভক্তরাই তাঁর তথাকথিত জন্ম-মৃত্যু নিয়ে গবেষণা করতে উদ্যত হয়। কারণ এই পাষণ্ডীরা তো ভগবানের কৃপা লাভ থেকে বঞ্চিত। পেঁচার কাছে সূর্যের আলো পৌঁছায় কি?

১.২ মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলার প্রস্তুতি

শ্রীমন মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলার প্রস্তুতি শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ থেকেই বুঝা যায়। মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রী অদ্বৈত আচার্য্য "গৌর আনা ঠাকুর" নামে সুবিদিত।

শ্রী অদ্বৈত প্রভু গঙ্গাজল এবং তুলসী দ্বারা আহ্বান করে মহাপ্রভুকে এই জগতে এনেছেন। তাঁর দ্বারা পুজিত হয়ে তাঁরই ইচ্ছানুসারে শ্রী গৌরহরি জগতে দেব-দুর্লভ কৃষ্ণ প্রেম স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকলকে বিতরণ করেছেন। একসময় আবার তিনিই তর্জার আকারে বিসর্জন মন্ত্র ব্যক্ত করলে গৌরহরি অপ্রকট হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু পুরীধামে একসময় গোপীলীলা অভিনয় করার পর তার ভক্ত পণ্ডিত জগদানন্দকে দিয়ে প্রসাদ এবং বস্ত্রাদি শচী মাতার জন্য পাঠান।

"গোপী লীলায় পাইলা যে প্রসাদ বসনে।
মাতারে পাঠান তাহা পুরীর বচনে ॥
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে।
মাতারে পৃথক পাঠান, আর ভক্তজনে ॥"

(চৈ. চ. ৩/১৯/১২)

পণ্ডিত জগদানন্দ নবদ্বীপে প্রায় একমাস কাটিয়ে পুরীতে ফেরার সময় অদ্বৈত প্রভুর সাথে দেখা করেন। ঐ সময়ই অদ্বৈত প্রভু গৌরহরিকে লীলা সঙ্গোপন করার ইঙ্গিত/সংকেত এক তজ্জা-প্রহেলীর মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন—

"বাউলকে কহিহ—লোক হইল বাউল
বাউলকে কহিহ—হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিহ—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

(চৈ. চ. ৩/১৯/২০-২১)

অর্থাৎ মহাপ্রভুকে জানিয়ে দিও যে, লোক সকল কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হয়েছে। প্রেমের সেই বাজারে চাল বিক্রয়ের আর স্থল নেই। প্রেমে ব্যাকুল চিত্ত হয়ে কুটুম্ব-পোষণের কাজে তাদের আর সেই মন নেই। মহাপ্রভুকে বলে দিও যে, প্রেমোন্মত্ত অদ্বৈতই এই কথা বলেছেন। এই তর্জ্জার তাৎপর্য ছিল : হে প্রভু যে উদ্দেশ্যে আমি আপনাকে এই ভূ-লোকে আবির্ভূত করিয়েছিলাম সেই উদ্দেশ্য আমার পূর্ণ হয়েছে। জগৎ কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছে। অতএব আপনার অবতরণের জন্য আমার যে দায়বদ্ধতা ছিল, তা এখানে সমাপ্ত হল—অর্থাৎ নিত্য শ্রীগোলক ধামে আপনার প্রত্যাবর্তন এখন হতে পারে।

তর্জ্জার উপরোক্ত গভীর তাৎপর্য সম্পর্কে ভক্ত জগদানন্দ কোন ধারণা করতে না পেরে পুরীতে এসে মহাপ্রভুকে তা অবিকল জানালেন।

এই শুনে গৌরহরি ঈষৎ হেসে বললেন "তার যেই আজ্ঞা" (চৈ. চ. ৩/১৯/২৩)

শ্রী স্বরূপদামোদর এই কথা শুনেই গৌরহরির মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তারপরও নীচু স্বরে মহাপ্রভুকে বলেন যে, তর্জ্জার অর্থ তিনি বুঝতে পারেন নাই। উত্তরে গৌরহরি বললেন—

প্রভু কহেন—আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল।
উপাসনা লাগি দেবের করেন আবাহন।
পূজা লাগি কত কাল করেন নিরোধন।
পূজা-নির্ব্বহন হৈলে পাছে করেন বিসর্জ্জন।

(চৈ. চ. ৩/১৯/২৫-২৭)

আগম শাস্ত্রের বিধি হল : কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাঁর বিশেষ আবাহনে যখন কারও আগমন হয় তখন তার (আবাহনকারীর) উদ্দেশ্য পূরণ বা সিদ্ধ হয়েছে এই কথা বা সংবাদ তিনি নিজে না জানালে আগমনকারীর নিজের ইচ্ছায় প্রত্যাবর্তন অসৌজন্যমূলক হয়। এইজন্যই শ্রী ভগবান সর্বশক্তিমান এবং সর্বস্বতন্ত্র হলেও আগম শাস্ত্রের বিধি অতিক্রম করেন না। অর্থাৎ ভক্তের মর্যাদা তিনি সর্বতোভাবে রক্ষা করেন।

শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রচিত শ্রী **অদ্বৈত অষ্টকম**-এ শ্রী অদ্বৈত প্রভু কর্তৃক শ্রী গৌরহরির আকর্ষণ এবং পুনরায় অন্তর্ধানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তাই শ্রী অদ্বৈত প্রভুর উপরোক্ত তর্জ্জা পাওয়ার পর থেকেই গৌরহরি এক ভিন্ন দশায় উপনীত হন। শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদজনিত বিপ্রলম্ভ ভাব তখন দ্বিগুণ হয়ে প্রতি সময়ে তা বাড়তে আরম্ভ করলো।

"সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥
উন্মাদ, প্রলাপ, চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥

(চৈ. চ. ৩/১৯/৩০-৩১)

গৌড় পার্ষদ ভক্তগণ এই পরম অদ্ভুত দশা অবলোকন করে বুঝতে পারেন **"মহাপ্রভু শীঘ্রই অপ্রকট হবেন।"** আর স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দের সাথে নিরন্তর শ্রীমদ্ ভাগবত, শ্রী গীত গোবিন্দ, কৃষ্ণ কর্ণামৃত, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ইত্যাদি থেকে ব্রজের ভাব উদ্দীপক বিভিন্ন শ্লোক শ্রবণ এবং আস্বাদন করে দিবারাত্রি উপরোক্ত দিব্যোন্মাদ দশায় বিভোর হয়ে থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ থেকে মথুরা গমনে কৃষ্ণ বিরহকাতরা শ্রীমতি রাধিকার যে অনন্য উদ্ ঘূর্ণা-দশা লাভ হতো, মহাপ্রভুও ঐ ধরনের অপ্রাকৃত হর্ষ-ঈর্ষা-দৈন্য-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর্ত্তিতে সবসময় আবিষ্ট হয়ে থাকতেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদের শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে এর প্রতিফলন দেখা যায়—

> **"সখি হে, কোথা কৃষ্ণ কর হে দর্শন।**
> **ক্ষণেকে যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক,**
> **শীঘ্র দেখাহ, না রহে জীবন ॥**

এই ধরনের রাধাভাবাবেশে প্রিয়তমের সাথে মিলনের তীব্র লালসায় একদিন শ্রী গৌরহরি অপ্রকট হয়ে যান।

১.৩ মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে নানা মত এবং প্রচার

মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে এই পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের মত এবং প্রচার দেখতে পাওয়া যায়। তবে বলা অথবা জানা দরকার যে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য শ্রী চৈতন্য চরিত লেখকদের মধ্যে শ্রীল কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, কবি কর্ণপুর, শ্রীপাদ মুরারী গুপ্ত এবং পরবর্তীকালের প্রকৃত গৌড় ভক্তবৃন্দ উড়িষ্যার লেখকদের মত **"জগন্নাথ বিগ্রহের মধ্যে মহাপ্রভুর প্রবেশ"** বা **"গোপীনাথ বিগ্রহের মধ্যে প্রবেশ"** এটিও লেখেন নাই। তবে ১৮০০ খৃস্টাব্দে লিখিত শ্রী নরহরি চক্রবর্তী প্রভুর **"ভক্তি রত্নাকর"** গ্রন্থে গোপীনাথ দেহে মহাপ্রভুর প্রবেশ এই উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরিত লেখকগণ তিনটি শব্দমাত্র ব্যবহার করেছেন—অন্তর্ধান, তিরোধান/ তিরোভাব এবং সঙ্গোপন—যার অর্থ অদৃশ্য বা অপ্রকট হয়ে যাওয়া বুঝায়। অর্থাৎ

ভক্তগণের মধ্যে কেউ তিরোভাবের পর তাঁর দেহ মর্ত ভূমিতে পড়ে ছিল বলে দেখতে পান নাই। অন্য কথায় তিঁনি জড়জগৎ থেকে অদৃশ্য হয়ে যান।

তারপরও কিছু অর্বাচীন এবং অপ্রামাণিক গ্রন্থে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে কল্পকাহিনী দেখতে পাওয়া যায়। আবার কিছু তথাকথিত শাস্ত্রবিদ, পণ্ডিত ও গবেষক নিজেদের মনোধর্মী বিশ্লেষণ এই প্রসঙ্গে করেছেন। আমরা এই ক্ষুদ্র বইতে এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

১.৪ জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের ব্যাখ্যা

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকট সম্পর্কে প্রথম অপবাদ/অপপ্রচার তথা মিথ্যা কাহিনী হল এই যে, শ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় পুরীর রাজপথে সংকীর্ত্তণের সময় নৃত্যকালে একসময় পথের ইষ্টক খণ্ডে তিঁনি আঘাত পান। চরণের ক্ষতস্থানে বিষক্রিয়ায় তাঁর অকাল মৃত্যু হয়। জয়ানন্দ নামের এক মহা পাষণ্ডী তার তথাকথিত **চৈতন্য মঙ্গল** বইতে বলেন : আষাঢ় মাসের রথযাত্রাতে রথের সামনে মহাপ্রভু কীর্ত্তন করার সময় তাঁর বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ইটের আঘাতে বিদীর্ণ হয়। সেইদিন থেকে ষষ্ঠ দিনেতে তাঁর এই অঙ্গুলির ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠে এবং তাঁকে বাধ্য হয়ে টোটাতেই (আই টোটা) থাকতে হয়। তিনি কেবল গদাধর পণ্ডিতকে জানালেন যে পরবর্তী রাত্রি ১০টায় তিনি এই জগৎ ত্যাগ করে চলে যাবেন এবং ... মায়ার শরীর তথা পড়িয়া রহিল যখন তিনি বিষ্ণু রথে চড়ে বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন।

জয়ানন্দ তার চৈতন্য মঙ্গল বইতে মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে যা বলেছেন তা অত্যন্ত অপরাধজনক এবং হাস্যাস্পদ। তার বইয়ের সবকিছু ঘটনাই বিভ্রান্তিকর। মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলা সম্পর্কে যাই কিছু লিখেছেন তা প্ররোচণামূলক। অথচ তিনি নিজেকে জাহির করেছেন গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য বলে যা একেবারেই অবাস্তব। তিনি ঘোর বিষ্ণু বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ স্মার্ত রঘুনন্দন শিরোমণির বংশধর ছিলেন। তাই

স্বভাবতই মহাপ্রভুর চরম বিরোধী হয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে চৈতন্য মঙ্গল বইটি লিখে প্রভুর পুত পবিত্র চরিত্রকে যে কলঙ্কিত করবেন—এই স্বাভাবিক। কিন্তু বিজ্ঞ বৈষ্ণবদের কাছে তার এই চতুরতা এবং দুর্বুদ্ধি ধরা পড়তে কোন অসুবিধা হয় না।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বিখ্যাত ভাষাবিদ) তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত বইয়ের ৩য় সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৩৯৫-৪০৬) জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল সম্পর্কে বলেছেন : জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল বাংলা ১৩০৬ সালে প্রথম জানা যায় এবং বাংলা ১৩১১ সালে অর্থাৎ ইংরেজি ১৯০৬ সালে প্রথম নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ সাহিত্য পরিষদ থেকে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন। কি বৈষ্ণব সমাজ, কি বাঙালি, সাহিত্যিক কেহ ঐ পুস্তকের বিষয়বস্তু নির্ভরশীল বা বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারেন নাই। ড. অসিত বাবু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলেন যে, এই পুস্তক বিভ্রান্তিকর, ক্রম-ভঙ্গ এবং এতে সর্বপরিচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব অনুপস্থিত। এই পুস্তক কোনদিনই বৈষ্ণবদের দ্বারা অনুমোদিত হয় নাই। এটাকে না জীবনী কাব্য, না ঐতিহাসিক বলে গ্রহণ করা যায়।

তাহলে দেখা গেল জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল পুস্তক অপ্রামাণিক এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রসম্মত নয়। তাই মহাপ্রভুর অপ্রকট সম্পর্কে এই বইয়ের বর্ণনাও অশাস্ত্রীয় বলে অগ্রহণযোগ্য। এরপরও এই বই যে ভুয়া বা জাল গ্রন্থ তাও বৈষ্ণব মহাজনেরা প্রমাণ করেছেন।

১. প্রথমতঃ চৈতন্য বিরোধী পাষণ্ডীরা জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল বইকেই উপজীব্য ধরে মহাপ্রভুর জীবনচরিত কলঙ্কিত করার সর্বপ্রকারের চেষ্টা করেন। তারা বলেন এই বই নাকি মহাপ্রভুর তিরোধানের মাত্র ৭ বছর পর রচিত হয়।

শ্রী গৌর পার্ষদ শ্রীল লোচন দাস ঠাকুরের রচিত একটি বই আছে। তার নাম শ্রী চৈতন্য মঙ্গল। জয়ানন্দের পর এই বই রচনা করলে শ্রীলোচন দাস নিশ্চয়ই তাঁর বইয়ের নাম শ্রী চৈতন্য মঙ্গল রাখতেন না। শ্রীলোচন দাসের সমকালীন শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচিত গ্রন্থও

এক সময় শ্রী চৈতন্য মঙ্গল নামে পরিচিত ছিল যা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ দেখা যায়—

"বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল
যাহার শ্রবণে নামে সর্ব অমঙ্গল ॥

(চৈ. চ. ১/৮/৩৫)।

সেই যুগে কোন একাধিক বইয়ের নাম একইরকম রাখা প্রথা বিরুদ্ধ ছিল বিধায় শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর পরে তাঁর বইয়ের নাম পরিবর্তন করে **শ্রী চৈতন্য ভাগবত** রাখেন। তাই জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল মহাপ্রভুর তিরোধানের পর পরই রচিত হলে শ্রীলোচন দাস ঠাকুর প্রথা ভঙ্গ করে কখনোই তাঁর বইয়ের নাম শ্রী চৈতন্য মঙ্গল রাখতেন না।

২. দ্বিতীয়তঃ জয়ানন্দের সমর্থকরা বলেন তার বই নাকি মহাপ্রভুর তিরোধানের ৭ বছর পর রচিত হয়েছে। যদি তাই হয় তবে জয়ানন্দ নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর সম-সাময়িক ছিলেন। আবার জয়ানন্দ যদি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য হন তবে তিনি নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর অনুগত কোন বিশেষ জন হওয়ার কথা। তাহলে জয়ানন্দের নাম কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায় না কেন? মহাপ্রভুর প্রকট কালে যেসব ভক্ত আবির্ভূত হন তাঁদের বিবরণ **শ্রী চৈতন্য ভাগবত, শ্রী চৈতন্য মঙ্গল, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত** গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরবর্তী গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গ এবং প্রকট লীলার সময় যেসব ভক্তের বিবরণ অবশিষ্ট ছিল তা শ্রীপাদ নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর বিরচিত **"ভক্তি রত্নাকর"** গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক যে এই গ্রন্থেরও কোথাও জয়ানন্দের নাম নেই। আবার শ্রীপাদ দেবকী নন্দন দাস তাঁর **"বৈষ্ণব বন্দনা"** বইতে কোন খ্যাতনামা ভক্তের নাম বাদ দেননি। তিনি কীভাবে বিভিন্ন বৈষ্ণবদের নাম সংগ্রহ করেছিলেন তা নিজেই বর্ণনা করেছেন—

**বৈষ্ণব গোঁসাঞির নাম উদ্দেশ্য-কারণ।
নানা ক্ষেত্র তীর্থ মুঞি করিনু গমন ॥**

যথা যথা যাঁর নাম শুনিনু শ্রবণে।
যাঁর যাঁর পাদপদ্ম দেখিনু নয়নে ॥
শাস্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিনু শুনিনু।
সর্ব্ব-প্রভুর নাম মালা গ্রন্থন করিনু ॥

এত বিস্তৃত এবং নিবিড় অনুসন্ধানেও কিন্তু জয়ানন্দের নাম নেই। তাই জয়ানন্দ যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম-সাময়িক কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন না—তা স্পষ্টই প্রমানিত হয়। তাই এরূপ অবৈষ্ণব যদি কোন কল্পকাহিনীসমৃদ্ধ কোন বই লেখেন তা কি শুদ্ধ ভক্তদের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে? না কোনমতেই নয়। তাই মহাপ্রভুর অপ্রকট সম্পর্কে জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে যা বলা হয়েছে তা আষাঢ়ে গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩. তৃতীয়তঃ জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল অনুযায়ী মহাপ্রভু বিষ্ণুর রথে চড়ে বৈকুণ্ঠে চলে গেলেও তাঁর মায়ার শরীর এই জগতেই পড়েছিল। পাঠকবর্গ দেখুন মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্বের প্রতি জয়ানন্দের যদি এতটুকু বিশ্বাস থাকতো তাহলে প্রভুর সচ্চিদানন্দ দেহকে 'মায়ার শরীর' বলতে পারে কি? এ কি কোন ভক্ত কল্পনাও করতে পারে?

শ্রীমদ্ ভাগবতসহ সকল শাস্ত্রই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে ভগবান এই জড় পৃথিবীতে আগমন করলেও তিনি এর প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ হয়ে পড়েন না। আত্মরূপেই তিনি সবসময় অবস্থান করেন। **বরাহ পুরাণে** স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে ভগবানের মাংস-মেদ-অস্থিজাত কোন প্রাকৃত-মূর্তি নেই, তিনি সবসময়ই প্রকৃতির উর্ধ্বে। ভগবান সত্যরূপ, অচ্যুত এবং বিভু চৈতন্য। **বৃহৎ বিষ্ণু পুরাণে** তাই বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভগবানের বিগ্রহকে ভৌতিক (অর্থাৎ রক্ত-মাংসের) বলে মনে করে তাকে সমস্ত শ্রৌত-স্মার্ত বিধান থেকে বের করে দেয়া উচিত, এমনকি তার মুখ দেখামাত্র সবস্ত্রে স্নান করা উচিত।

**প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥**

(চৈ. চ. ১/৭/১১৫)

সুতরাং জয়ানন্দ যে কত বড় অপরাধী তা নিশ্চয়ই পাঠক-পাঠিকরা এখন বুঝতে পারছেন।

৪. চতুর্থতঃ জয়ানন্দের তথাকথিত চৈতন্য মঙ্গল বই অনুযায়ী চরণের ক্ষতস্থানের বিষক্রিয়ায় মহাপ্রভুর অকাল মৃত্যু হয়েছে। এটি গাঁজাখুরি কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রী অঙ্গতো পঞ্চভৌতিক কিছু নয়। পঞ্চভূতের (মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি এবং আকাশ এই পাঁচটি পদার্থের মাধ্যমে জীবদেহ গঠিত বলে তাকে পঞ্চ ভৌতিক দেহ বলা হয়) শরীরেই কোন ক্ষতজনিত বিষক্রিয়া, পচন রোগ ইত্যাদি হতে পারে। যে দেহে জড়াপ্রকৃতির গন্ধমাত্র নেই, সে স্থলে এসব প্রাকৃতিক বিকার কীভাবে সম্ভব?

৫. পঞ্চমতঃ মহাপ্রভু অনেক সময়ই উদ্দণ্ড নৃত্য করতেন। নৃত্য করতে করতে কখনো কখনো তিনি আছাড় খেতেন। তাতেও তাঁর কিছুই হতো না। আর হবেই বা কি করে? তিনি যে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। তাঁর আবার কি হতে পারে?

> **"শুনিলে কীর্ত্তন মাত্র প্রভুর শরীরে।**
> **বাহ্য নাহি থাকে পড়ে পৃথিবী উপরে**
> **হেন সে আছাড়, প্রভু পরে নিরন্তর।**
> **পৃথ্বি হয় খণ্ড খণ্ড সবে পায় ডর ॥**
>
> (শ্রী চৈতন্য ভাগবত ২/৮/১২৩-১২৪)

শচীমাতাতো তাঁর নিমাইয়ের নৃত্যে আনন্দ অপেক্ষা সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতেন—

> **"সে কোমল শরীরে আছাড় বড় দেখি।**
> **গোবিন্দ স্মরয়ে আই মুদি দুই আঁখি ॥"**
>
> (শ্রী চৈতন্য ভাগবত ২/৮/১২৫)

একসময় মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রার পথে রামকেলি নামক এক গ্রামে ভক্তগণসহ উপস্থিত হন। ঐ সময় গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের

কোতোয়াল তাঁর সম্পর্কে খবরাখবর জানার জন্য সেখানে এসে মহাপ্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য দেখে অবাক হয়ে যান। বাদশাহের কাছে গিয়ে ঐ কোতোয়াল মহাপ্রভুর বিস্তর প্রশংসা করেন এবং বলেন—

"নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ।
তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ॥
এক দণ্ডে পড়েন আছাড়ে শত শত।
পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গে নহে ক্ষত॥

(শ্রী চৈতন্য ভাগবত ৩/৪/৩৫-৩৬)

পাঠক-পাঠিকারা এখন দেখুন এবং বুঝুন মহাপ্রভুর পুরীধামে নৃত্যকালে সামান্য এক ইষ্টক খণ্ডে আহত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণের গল্প কি নিতান্ত হাস্যকর নয়?

৬. ষষ্ঠতঃ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ হলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভু। তাঁর স্পর্শমাত্রই কুষ্ঠ, কণ্ডুয়ন, বিসুচিকা (কলেরা) ইত্যাদি ব্যধিসহ ভবব্যধি থেকে মুক্ত হয়ে জীব কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হতো। সেই তিনি সামান্য ইষ্টক খণ্ডের ক্ষতে বিষক্রিয়ায় প্রাণত্যাগ করলেন—এর চেয়ে বড় আর আষাঢ়ে গল্প কি হতে পারে?

জয়ানন্দের কাহিনী যে বিষ্ণু-বিদ্বেষ এবং নাস্তিক মনোভাব থেকে উদ্ভুত হয়েছে এতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

১.৫ মাধব পট্টনায়কের নামে জাল রচনা

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে আধুনিকতম এক কল্পকাহিনী উড়িষ্যার শ্রীপাণ্ডা নামে এক লেখকের **"শ্রী চৈতন্যের দিব্য জীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব্ব"** নামক এক বইতে পাওয়া যায়। এই লেখক শ্রী মাধব পট্টনায়ক বিরচিত কোন এক **"বৈষ্ণব লীলামৃত"** বইয়ের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে মহাপ্রভুর মৃত্যুর (?) রহস্য উদ্‌ঘাটনের দাবি করেছেন। তার মতে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু রুক্মিনী অমাবশ্যাতে ইষ্টক খণ্ডের আঘাতে বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আঘাত পেয়ে অক্ষয় তৃতীয়াতে জগন্নাথ মন্দিরে (উত্তর পাশের মণ্ডপে) প্রাণ ত্যাগ করেন। এই অবস্থায় শ্রী রামানন্দ রায় শোকাহত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাজা প্রতাপরুদ্রকে শ্রী চৈতন্য

দেবের মৃতদেহ জগন্নাথ মন্দির এলাকা থেকে বের না করে বরং মন্দিরস্থ কোইলী বৈকুণ্ঠে গৌড়ীয় ভক্তগণের অগোচরে সমাধিস্থ করার পরামর্শ দেন। পরে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের কাছে মহাপ্রভু জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হয়েছেন—এটি প্রচার করে দিলেই চলবে। নতুবা উৎকলবাসী ভক্তদের উপর আগে থেকে ক্ষিপ্ত গৌড়ীয়রা আবার এই ঘটনাকেকেন্দ্র করে নানা সংশয়, বিবাদ ইত্যাদি করতে পারে। এমনকি তাঁদের মুসলিম শাসককে দিয়ে উৎকলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। শোকাচ্ছন্ন রাজা যুদ্ধ-বিগ্রহের ভয়ে তখন শ্রীরামানন্দের প্রস্তাব মেনে নেন। এটি এক অদ্ভুত আষাঢ়ে গল্প। আসলে বৈষ্ণব লীলামৃত বইটিই যে জাল তাই আমরা নিচে প্রমাণ করবো।

১. প্রথমতঃ মহাপ্রভুর ইষ্টক আঘাত থেকে প্রাণ ত্যাগ করা পর্যন্ত সময়ে কোন্ যাদু বলে সমগ্র পুরী ধাম একেবারে গৌড়ীয় ভক্তশূন্য হয়ে গেল যে পরে গৌড়ীয় ভক্তগণকে কিছু একটা বলে প্রবোধ দিলেই যথেষ্ট হবে? শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সবসময়ের সহচর শ্রী স্বরূপ দামোদর, শ্রী গদাধর পণ্ডিত, শ্রী জগদানন্দ পণ্ডিত, সেবক শ্রী গোবিন্দ, শ্রী শঙ্কর পণ্ডিত, শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁরা সে সময় কোথায় ছিলেন? এসব প্রসিদ্ধ ভক্তগণকে এড়িয়ে উপরোক্ত সবকিছু করা কি সম্ভব ছিল?

২. দ্বিতীয়তঃ মহাপ্রভু ইষ্টকের আঘাতে সংজ্ঞাহীন হয়ে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন—এ কথাও উক্ত শ্রী পাণ্ডাজী বলেছেন। অথচ তাঁর (মহাপ্রভুর) ঐ ভীষণ অসুস্থতার খবর চারদিকে প্রচার না হয়ে কেবলমাত্র উৎকলের (উড়িষ্যার) ভক্তরাই শুধু জানতে পারলেন একথা কি কোনভাবে বিশ্বাসযোগ্য?

৩. তৃতীয়তঃ বলা হয়েছে নৃত্যকালে ইষ্টক খণ্ডের আঘাতে মহাপ্রভু জ্ঞানহারা হয়ে পড়লে প্রচুর রক্তক্ষরণ অবস্থায় উৎকলীয় সঙ্গীগণ তাঁকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে উত্তর পাশের মণ্ডবে চিৎ করে শুইয়ে দেন। কিন্তু এই ধরনের রক্তপুত অবস্থায় তাঁকে রাস্তা থেকে জগন্নাথ মন্দিরের মণ্ডপে বয়ে নিয়ে আসায় স্মার্ত্ত পণ্ডিতরা এবং এমনকি কাশী মিশ্রও কিছু প্রতিবাদ করলেন না?

৪. চতুর্থতঃ অক্ষয় তৃতীয়া পর্যন্ত মহাপ্রভু সেই মণ্ডপেই পড়েছিলেন। উৎকলের ভক্তরা মহাপ্রভুর প্রতি প্রেমাতিশয্যেও তাঁকে সেই দুর্ঘটনাস্থল থেকে নিজ গৃহে নেওয়ার অথবা সেই মণ্ডপ থেকে স্থানান্তরের প্রয়োজনবোধ করলেন না?

৫. পঞ্চমতঃ মহাপ্রভু নীলাচলে প্রথম জগন্নাথ দর্শনের সময় ভাবের আবেশে মুচ্ছিত হয়ে পড়লে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও সেই সন্ন্যাসীকে জগন্নাথমন্দির থেকে পরম আদরে নিজের গৃহে নিয়ে পরিচর্যা করেছিলেন। আর দীর্ঘ ২৪ বছরের পরিচয়েও সেই প্রাণাধিক প্রভুর প্রচুর রক্তপাত এবং প্রবল জ্বর অবস্থায় শ্রী ভট্টাচার্য্য এবং অপরাপর উৎকলীয় ভক্তরা তাঁকে মণ্ডপে শুইয়ে রাখলেন? আহা মহাপ্রভুর ভাগ্যের কি বিপর্যয়! কি অসত্য এবং কল্পকাহিনী। শুনলেও মহা অপরাধ হয়।

৬. ষষ্ঠতঃ কোইলী বৈকুণ্ঠে কেবল জগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্রার প্রাচীন বিগ্রহের সমাধি দেয়ার বিধান। সেখানে কোন মানুষের যতই উচ্চাধিকারী এবং এমনকি সাক্ষাৎ ঈশ্বর সমান হন না কেন—সমাধি দেয়ার নীতি বা দৃষ্টান্ত নেই। (শ্রী পাণ্ডাজি তার তথাকথিত গবেষণায় মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করেন নাই। পরিবর্তে কায়দা করে সাক্ষাৎ ঈশ্বর সমান বলেছেন। আবার তাঁকে শুধুমাত্র পুণ্য দেহের অধিকারী বলেন)।

৭. সপ্তমতঃ গৌড় বিদ্বেষী এই পাণ্ডাজী তার বইয়ের এক জায়গায় বলেন : "রাধাগোবিন্দ নাথ শ্রী চৈতন্য ভাগবত সম্পাদনা প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে এঁদের কখনই সাধারণ মৃত্যু হয় না। তা না হোক, মরদেহ অন্তর্হিত হয়ে যাবে একথা কেউই স্বীকার করে নেবেন না, নিতেও পারেননি।" (পৃ. ১০৭)। অথচ শ্রুতি-স্মৃতি সব শাস্ত্রেই মহাপ্রভুকে পরমেশ্বর ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া ভারতের দক্ষিণ অংশ ভ্রমণের সময় দুইবার অর্ন্তহিত হওয়ার ঘটনা তো তাঁর জীবনীতেই পাওয়া যায়।

সুতরাং পাণ্ডাজীর তথাকথিত গবেষণা, একটি অসংখ্য ভুলে ভরা কল্পকাহিনী—এইমাত্র বলা যায়।

১.৬ মারাত্মক অপবাদ : শ্রী চৈতন্যদেব পুরীর পাণ্ডাদের দ্বারা নিহত

চরম ভগবৎ বিরোধী কিছু লোক এই অপবাদ ছড়ায় যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পুরীর পাণ্ডাগণ কর্তৃক গুম-খুন হয়েছেন। অর্থাৎ পুরীর কিছু পাণ্ডা মহাপ্রভুর চরম বিরোধী ছিলেন। তারাই একসময় ষড়যন্ত্র করে মহাপ্রভুকে গোপনে খুন করে শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের কোন এক স্থানে প্রোথিত করে রেখেছেন। এই মারাত্মক অপবাদের সূত্র ধরে কিছু লোক বিভিন্ন ছদ্মনামে কিছু অকথ্য কাহিনীও রচনা করেছেন। এরা হলেন আত্মঘাতি এবং চরম বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব বিরোধী। এই অপবাদের জবাব দেয়ার ভাষা নেই।

১. প্রথমতঃ বিভু আত্মা ভগবানকে কখনো খুন করা সম্ভব নয়। অণু জীবাত্মাই যেখানে অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জল দ্বারা সিক্ত হয় না, বায়ুতে শুষ্ক হয় না, সেখানে বিভু আত্মার তো কথাই নেই। সর্ব আত্মার আত্মা হলেন বিভু আত্মা। তাছাড়া জীবের বেলায় দেহ এবং দেহীর (আত্মা) মধ্যে ভেদ আছে। ভগবানের ক্ষেত্রে এই প্রকারভেদ নেই।

দেহ-দেহী বিভাগোহয়ংনেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ

(কুর্ম্ম পুরাণ)

ভগবান যেখানেই যেরূপে অবস্থান করুন না কেন কখনো তাঁর জীবদের মতো দেহ ও দেহীর পার্থক্য থাকে না। তাই বিভু-আত্মা স্বরূপ ভগবান কীভাবে অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন অথবা গুণ-খুন হতে পারেন?

সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব আদি গায় যাহার চরিত্র

(চৈ. ভাগবত ২/৩)

—এই যার পরিচয় তার পবিত্র অঙ্গচ্ছেদন করা কার সাধ্য?

২. দ্বিতীয়তঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে আগেও কতিপয় আসুরিক মনোভাবাপন্ন লোক হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানকে

কি হত্যা করা যায়? যেমন ভারতের দক্ষিণ অঞ্চল ভ্রমণের সময় এক পাষণ্ডী বৌদ্ধ আচার্য্য মহাপ্রভুর সাথে শাস্ত্রীয় বিচারে হেরে তাঁকে বিষযুক্ত অপবিত্র অন্ন ভোজন করতে দিয়েছিলেন। এর প্রতিফল ঐ বৌদ্ধ আচার্য্যকে তাৎক্ষণিকভাবে ভোগ করতে হয়েছিল—

"হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ঠোঁটে করি অন্নসহ থালি লঞা গেল ॥
বৌদ্ধগণের উপরে অন্ন পড়ে অমেধ্য হইয়া।
বৌদ্ধাচার্য্যর মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া ॥
তেরছে পড়িলা থালি, মাথা কাটি গেল।
মুচ্ছিত হঞা আচার্য্য ভূমিতে পড়িল ॥"

(চৈ. চ. ২/৯/৫৪-৫৬)

৩. তৃতীয়তঃ মহাপ্রভুকে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করতে গিয়ে অস্ত্রধারীরাই নিজেরা নিহত হয় এমন সত্য কাহিনীও শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে রয়েছে।

মহাপ্রভু ভ্রমণ করতে করতে একসময় মালাবার প্রদেশে এসে পৌছান। তার সেবক সরলমতি কৃষ্ণদাস তখন সেই জায়গার উচাটন-বশীকরণে পারদর্শী ভট্টথারি ব্রাহ্মণদের কবলে পড়েন। ভক্ত বৎসল প্রভু সেই ভট্টথারিদের কাছে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণদাসকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। এর ফলে হিংসুক ভট্টথারিরা মহাপ্রভুকেই অস্ত্রসহ আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু প্রভুর অপ্রাকৃত প্রভাবে ঐসব অস্ত্র তাদের অঙ্গেই প্রতিঘাতরূপে পর্যবসিত হয়। তখন অপরাপর ভট্টথারিরা ভয়ে পালিয়ে যায়।

"শুনি সব ভট্টথারি উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইল সবে চারিদিকে ধাঞা ॥
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল, ভট্টথারি পলায় চারিদিকে ॥

(চৈ. চ. ২/৯/২৩১-২৩২)

যাঁর কথায় শ্রীবাসের মৃত পুত্র পর্যন্ত কথা বলেছিল (চৈ. ভাগবত ২/২৫ অ.), যার আলিঙ্গনেই দণ্ডকারণ্যের ক্রেতাযুগের সপ্ততাল বৃক্ষ সশরীরে বৈকুণ্ঠ যাত্রা করেছিল (চৈ. চ. ২/৯)—সেই অচিন্ত্যনীয় শক্তিময় মহাপ্রভু সম্পর্কে উপরোক্ত মিথ্যা অপবাদ প্রচার কি ধরনের আসুরিকতা তা কি কল্পনা করা যায়?

৪. চতুর্থতঃ নীলাচলবাসী মহাপণ্ডিত শ্রী সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত লোক পর্যন্ত মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান বলে বুঝতে পারেন। ফলে স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র এবং সমগ্র নীলাচলবাসী মহাপ্রভুকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলে জানতে পারে।

"লোহাকে যাবৎ স্পর্শী হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥
ভট্টচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন"

(চৈ. চ. ২/৬/২৭৯-২৮০)

এহেন অবস্থায় কোন পাণ্ডার পক্ষে কি সম্ভব মহাপ্রভুকে গোপনে খুন করে গুম করে রাখা?

৫. পঞ্চমতঃ পুরীর পাণ্ডাগণ বংশ পরম্পরায় ব্রহ্মার পঞ্চম অধঃস্তন শ্রী ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের সময় থেকেই রাজার আজ্ঞাবাহীদাস। আবার যেসব নীলাচলবাসী মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবক। যেমন সুবর্ণ বেত্রধারী কৃষ্ণদাস, লিখন অধিকারী শিখি মাহিতি, মহাসুপকার প্রদ্যুন্ন মিশ্র, প্রহররাজ পরমানন্দ মহাপাত্র, জগন্নাথের অঙ্গসেবনকারী জনার্দ্দন প্রমুখ।

যে পড়িছাগণ একসময় জগন্নাথ দেবকে আলিঙ্গনে উদ্যত হওয়ায় না বুঝে তাঁকে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তাঁরাও সুযোগ পেলেই মহাপ্রভুর একনিষ্ঠভাবে সেবা করতেন। তাছাড়া রাজা প্রতাপরুদ্রেরও এই বিষয়ে আদেশ ছিল।

পড়িছা কহে—"আমি সব সেবক তোমার।
যে তোমার ইচ্ছা, সেই কর্তব্য আমার"
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হঞাছে আমারে।
প্রভুর আজ্ঞা যেই শীঘ্র করিবারে ॥"

(চৈ. চ. ২/১২/৭৪-৭৫)

এই সময় থেকেই পড়িছাগণ মহাপ্রভুর জন্য জগন্নাথের প্রসাদী মালা চন্দন এবং মহাপ্রসাদের নিত্য ব্যবস্থা, গুণ্ডিচামার্জ্জনের ঘটাদি সংগ্রহ, মহাপ্রভুর দর্শনার্থী গৌড়ীয় ভক্তগণের জন্য বাসস্থান, মহাপ্রসাদ, স্বচ্ছন্দে জগন্নাথের দর্শনের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন সেবায় তাঁরা নিযুক্ত থাকতেন।

উপরোক্ত অবস্থায় মহাপ্রভুর প্রতি পাণ্ডাদের তথা পড়িছাদের রাগ-বিদ্বেষ পোষণের কোন অবকাশই ছিল না।

৬. ষষ্ঠতঃ মহাপ্রভুপ্রাণ রাজা প্রতাপরুদ্রের আমলে গৌরহরিকে কেউ কিছু বলবার যেখানে সাহস ছিল না সেখানে সামান্য পাণ্ডারা তাঁকে খুন-গুম করে রাখবে—এতো কল্পনাও করা যায় না।

১.৭ জড়বাদী কতিপয় পণ্ডিম্মন্য লেখকের মত

বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অধ্যাপক, পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি এবং গবেষকদের মধ্যে অনেকেই মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলকে অনেকটা নির্ভরযোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন দেখতে পাওয়া যায়। আবার কিছু প্রতিযশা অধ্যাপক যেমন ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে লিখিত কাহিনীকে একেবারেই বাতিল করে দিয়েছেন। খুবই পরিতাপের বিষয় যে ড. দীনেশচন্দ্র সেন-এর মতো প্রখ্যাত লেখক জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলকে নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেন। শুধু তাই নয় তিনি আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলেন যে, মহাপ্রভুর দেহ মন্দিরের ভিতর সমাধিস্থ করা হয়। যখন মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন তখন পুরোহিতরা বহিঃদ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভক্তদেরকে বাইরে রেখে এই সমাধি দেন। তিনি আরও

লিখেছেন তখন বহিঃদ্বারে কাশী মিশ্র, সনাতন, হরিদাস, শ্রীবাস এদের কাউকেই মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নাই। এইসব ভক্ত বহিঃদ্বারে ক্রন্দন করতে থাকেন। আবার বলেন, মহাপ্রভু জগন্নাথ বিগ্রহে লীন বা মিশে যান।

আমরা আগেই জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল যে অপ্রামাণিক এবং অনির্ভরযোগ্য বই তা প্রমাণ করেছি। এখানে একটা কথা বললেই যথেষ্ট যে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানকালে হরিদাস প্রভু থাকেন কি করে? মহাপ্রভুর কৃপাভিসিক্ত হয়ে তিনি তো অনেক আগেই দেহত্যাগ করেন।

আরও প্রশ্ন হলো কাশী মিশ্র ছিলেন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে একজন। তিনি রাজার অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং রাজগুরু ছিলেন। তাঁর মত ব্যক্তিকে গোপন করে এবং বাইরে রেখে জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিত বা পাণ্ডারা উপরোক্ত কাজ করতে পারে কি? তাদের সেই দুঃসাহসই বা হয় কি করে?

আবার ড. সেন বলেছেন মহাপ্রভুর সমাধির সময় সনাতন গোস্বামী নাকি মন্দিরের বহিঃদ্বারে ছিলেন। অথচ সনাতন প্রভু একবার মাত্র ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে পুরীতে এসেছিলেন। মহাপ্রভুর চরিত লেখকদের মধ্যে কারও লেখায়ই দেখা যায় না মন্দিরের পূজারি বা পুরোহিতরা কাশী মিশ্র, স্বরূপ দামোর, গোবিন্দ প্রমুখ ভক্ত অপেক্ষা মহাপ্রভুর কাছে বেশি প্রিয় ছিলেন। তাদের কি করে এমন সাহস হতে পারে? অধিকারের দাবি থাকতে পারে? পুরোহিতরা তো কাশী মিশ্রের বিনা অনুমতিতে কোন কাজই করতে পারতো না। কারণ কাশী মিশ্র রাজগুরু হওয়ায় যে কোন কাজ করতে গেলে পুরোহিতদেরকে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হতো। রাজা তাঁকে এতটাই সম্মান দিতেন যে মন্দির পরিচালনার সমস্ত সংবাদ পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে নিতেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে—

প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়ম।
যতদিন রহে তেঁহো শ্রী পুরুষোত্তমে ॥
নিত্য আসি করে মিশ্রের পাদ-সম্বাহন।
জগন্নাথ-সেবায় করে ভিয়ান শ্রবণ ॥

এ থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায় পুরোহিতদের চেয়ে কাশী মিশ্রের প্রভাব বা প্রতিপত্তি জগন্নাথ মন্দিরের উপর অনেক বেশি ছিল। আর এই কাশী মিশ্রকে মন্দিরের বহিঃদ্বারে রেখে দরজা বন্ধ করে গোপনে পুরোহিতরা মহাপ্রভুকে সমাধি দিল—এটা কি বিশ্বাস করা যায়?

আর আজ পর্যন্তও শোনা যায় নাই যে পুরীর মন্দিরে কাউকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। তাই ড. দীনেশচন্দ্র সেন-এর বক্তব্য কোন যুক্তিতেই ধোপে টিকে না।

ড. সেন আরও বলেন, ইটের আঘাতে ক্ষত হওয়ায় মহাপ্রভু ভীষণ জ্বর (high fever) নিয়ে মন্দিরে অবস্থানকালে পুরোহিতরা জানতে পেরেছিলেন যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হবে। তাই দর্শকরা যাতে মন্দিরে প্রবেশ না করতে পারে সেজন্য মন্দির বন্ধ করে দেয়া হয়। তারা এটা করেছিলেন যাতে মহাপ্রভুর সমাধির সময় সেখানে কেউ উপস্থিত না হয়। সমাধিস্থান আগের অবস্থায় না আনা পর্যন্ত নাকি মন্দিরের দরজা খোলা হয় নাই। রাত্রি ১টার সময় ঐ দরজা খোলা হয় এবং বহিঃদ্বারে অবস্থানরত ভক্তদেরকে জানানো হয় যে, মহাপ্রভু জগন্নাথের দেহে লীন হয়ে গেছেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো ড. সেন তাঁর লেখায় কোথা থেকে তিনি এই সময় এবং জগন্নাথে লীন হয়ে যাওয়ার তথ্য পেলেন তা উল্লেখ করেন নাই। একি তাঁর নিজের কল্পিত?

যে মহাপ্রভুর এত জ্বর এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবেন—এই অবস্থায় কোন অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে না নিয়ে একলাই মন্দিরে ঢুকলেন? আর ভক্তরাই তাঁকে একা যেতে দিলেন? সব ভক্তদেরকে বাদ দিয়ে পুরোহিতরা কি হঠাৎ তাঁর এত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁরাই সব কর্তব্য পালনের অধিকার পেয়েছিলেন? পুরোহিতরা মহাপ্রভুর সবচেয়ে প্রিয় ভক্ত ছিলেন একথা কোনদিন শুনা যায় নাই। পুরোহিতরা মহাপ্রভুর ভক্ত থাকলেও তাঁরা মূলত বিষয়ী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখা যায়—

জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীগণ।
সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেতে গমন ॥

মহাপ্রভু কখনোই বিষয়ীদের বহুমানন করেন নাই। তাই মহাপ্রভু নিজের অন্তরঙ্গ ভক্তদেরকে দূরে রেখে জীবনের শেষ পর্যায়ে বিষয়ী পুরোহিতদেরকে সমাধির অধিকার দিয়েছিলেন—এরূপ কথা কি হাস্যকর নয়? পুরোহিতরা মহাপ্রভুর পবিত্র দেহকে সমাধিস্থ করেছিল—এরূপ কথা বলাই ভীষণ অপরাধজনক।

ড. এ. এন. চ্যাটার্জি নামের একজন গবেষক তার ইংরেজি ভাষায় লিখিত Vaisnava বইতে উড়িয়া ভাষায় লিখিত মহাপ্রভুর এক জীবনী বই থেকে কিছু বিষয় উল্লেখ করেন : "অচ্যুতানন্দ তাঁর (Sunny a Samhita) বইতে লিখেছেন, "একদিন গৌরচন্দ্র তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন ... জগন্নাথ মন্দিরের চতুর্দিকে হরিনাম ধ্বনিত হল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রাধা নাম উচ্চারণকরে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে করতে এক অপূর্ব জ্যোতিরূপ নিয়ে জগন্নাথের পবিত্র বিগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করলেন।"

দিবাকর দাস নামে একজন লেখক বলেন : "শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চিন্তা করলেন তাঁর স্বধামে প্রত্যাবর্তন করার জন্য এবং সেই মুহূর্তেই তিনি জগন্নাথ বিগ্রহের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এইভাবে জগন্নাথ দেহেতে অদৃশ্য হন, কারণ তিনি এবং জগন্নাথের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না।" শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁর অতি প্রিয় ভক্ত শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে সনাতন শিক্ষায় পরিষ্কারভাবে বলেছেন—

"মৌষল লীলা আর কৃষ্ণ অন্তর্ধান।
কেশাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥
মহিষীহরণ আদি সব-মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয় ॥"

এখন পাঠক-পাঠিকরাই বিচার করুন যে মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু স্বয়ং ভগবান অপ্রকটের সময় তার সচ্ছিদানন্দ বিগ্রহটির কি হতে পারে? জড় জাগতিক বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা, যাদের মধ্যে ভক্তির লেশমাত্র নেই তারা তো মস্তিষ্কের উর্বরতা নিয়ে নানা ধরনের কাল্পনিক বিচার করবেনই। যাঁরা সুমেধা ভক্ত এবং ভগবানের কৃপা দ্বারা

অভিষিক্ত তারা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। কেবল তারাই ভগবানের অপ্রকট লীলা বুঝতে সমর্থ, অন্যেরা নয়।

১.৮ শ্রীলোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ

শ্রী গৌর পার্ষদ শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীপাদ লোচন দাস ঠাকুরের শ্রী চৈতন্য মঙ্গল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কাছে একটি প্রামাণিক বইরূপে স্বীকৃত।

তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন একদিন চৈতন্য মহাপ্রভু কতিপয় ভক্তকে নিয়ে কাশী মিশ্রের ভবন (গম্ভীরা) থেকে জগন্নাথ দর্শনে যান। তিনি জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বার থেকে সরাসরি জগন্নাথের গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করেন এবং সেই মুহূর্তেই স্বাভাবিকভাবে মন্দিরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে যায়। চৈতন্য মঙ্গলে বলা হয়েছে—

সত্বরে চলিয়া গেল মন্দির ভিতর।
নিরখেবদন প্রভুর দেখিতে না পাই।
তৎক্ষণে দ্বারে নিজ লাগিলা কপাট ॥

এরপর মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরে অদৃশ্য হয়ে যান।

আবার উক্ত গ্রন্থের কিছু আধুনিক সংস্করণে আষাঢ় মাসে গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হওয়ার বর্ণনা দেখা যায়। অচিন্ত্য শক্তিমান ভগবান শ্রী গৌর সুন্দরের জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তবুও যথার্থ বিচারে উক্ত অংশে আধুনিকতাই প্রমাণিত হয়। কারণ শ্রীলোচন দাস ঠাকুর নিজে শ্রী মুরারী গুপ্তের "শ্রী চৈতন্য চরিত"-কে তাঁর বইয়ের মূলভিত্তিরূপে বলায় উক্ত লীন হওয়ার কাহিনী প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়।

শ্রী গৌড়ীয় মঠ থেকে শ্রী চৈতন্য মঙ্গল বইয়ের প্রথম এবং পরিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের আগেও শ্রীপাদ অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা উক্ত গ্রন্থের সম্পাদনা পরিলক্ষিত হয়। সেই গ্রন্থের শেষ খণ্ডের শেষভাগে সম্পাদকের পাদটীকায় দেখা যায় : "একখানি (সংস্কৃত

কলেজ লাইব্রেরির) পুঁথিতে এবং ১৭৭৪ শকাব্দে মুদ্রিত পুস্তকে এইখানেই গ্রন্থ সমাপ্তি হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদগুলি কেবলমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থে এবং একখানি আধুনিক হস্তলিখিত পুঁথিতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়ছে। মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠের সহিত আধুনিক হস্তলিখিত পুঁথিখানির পাঠে অনৈক্যও আছে।" সম্পাদকের কথিত "নিম্নলিখিত পদগুলি"-র মধ্যেই উক্ত লীন হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐ সকল অতিরিক্ত পংক্তির শেষ ভাগেই দেখা যায়—মহাপ্রভু গুণ্ডিচা মন্দিরে প্রবেশ করার পরই মন্দিরের দ্বার আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন বহিঃদ্বারে—

কাশী মিশ্র, সনাতন আর হরিদাস।
উৎকলের সভে কাঁদে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ॥

দ্বার দেশে উপস্থিত ভক্তদের এই তালিকা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় উক্ত গ্রন্থে (আধুনিক) শ্রী মন্ মহাপ্রভুর তিরোধান অংশটি পরবর্তীতে কোন লিপিকার কর্তৃক সংযোজিত হয়েছে।

১. প্রথমতঃ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে একবারমাত্র শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নীলাচলে আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর প্রকটকালেই তিনি তাঁর আদেশে শ্রীধাম বৃন্দাবনে ফিরে যান। শ্রীল সনাতন গোস্বামী একবারমাত্র বৃন্দাবন থেকে পুরীতে এসে এক বছরের মত অবস্থান করেন। সেটি ছিল ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ এবং তিনি হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে ছিলেন। দ্বিতীয়বার সনাতন গোস্বামী প্রভুর নীলাচলে আগমন অন্য কোন গ্রন্থ দ্বারাও সমর্থন পাওয়া যায় না।

২. দ্বিতীয়তঃ নীলাচলে মহাপ্রভুর পরম ভক্তদের মধ্যে দুইজন হরিদাসের নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে সর্বজনবিদিত নামাচার্য্য শ্রী হরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রভু স্বয়ং নীলাম্বুতটে সমাধিস্থ করেছিলেন। সেই সমাধি মন্দির এবং সেবা আজও প্রকট আছে। দ্বিতীয় হরিদাস ছোট হরিদাস নামে পরিচিত। প্রকৃতি সম্ভাষণ-জনিত অপরাধে মহাপ্রভু তাঁকে বর্জন করায় তিনি মহাপ্রভুর প্রকটকালেই প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে দেহ বিসর্জন দেন। তাই মহাপ্রভুর জগন্নাথে লীন হওয়ার সময়ে দ্বার দেশে কোন হরিদাসের উপস্থিতি একেবারেই অসম্ভব।

উপরোক্ত দুই যুক্তিতে বুঝা যায় শ্রী চৈতন্য মঙ্গলের আধুনিক সংস্করণে লিখিত অতিরিক্ত অংশ যথার্থ নয়। মনে হয় জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলের অসৎ বক্তব্যকে খণ্ডনের জন্যই পরবর্তীকালে শ্রী চৈতন্য মঙ্গলে আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর জগন্নাথবিগ্রহে লীন হয়ে যাওয়ার কাহিনী কোন অনভিজ্ঞ গোষ্ঠীর দ্বারা সন্নিবেশিত হয়েছে। বিষে বিষ ক্ষয়, কাটা দিয়ে কাটা তোলা ইত্যাদি রীতি থাকলেও জয়ানন্দের অসৎ বক্তব্য ভুল প্রমাণের জন্য গৌর পার্ষদগণের লেখনীই যথেষ্ট। এর জন্য অন্য কোন পন্থা অবলম্বনের কোন প্রয়োজনই ছিল না।

১.৯ শ্রীল নরহরি সরকার প্রভুর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ

শ্রী অদ্বৈত প্রভুর তর্জ্জা লাভের পর (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) মহাপ্রভু দিবারাত্রি দিব্য উন্মাদ অবস্থায় বিভোর হয়ে থাকতেন। শ্রী রাধাভাবের আবেশে শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রিয়তমের (কৃষ্ণের) সাথে মিলনের তীব্র লালসায় একদিন টোটা গোপীনাথের মন্দিরে এসে উপস্থিত হন। এই সেই গোপীনাথ—যাকে মহাপ্রভু একসময় অভিষিক্ত করে এই শ্রী মূর্ত্তিকেই তিনি নিজ শক্তি শ্রী গদাধরকে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। প্রাণের প্রিয় এই গদাধর প্রভুকেই তিনি অত্যন্ত সঙ্গোপনে তাঁর অন্তিম অভিলাষ ব্যক্ত করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের আগে চিরসাথী গদাধর ছিলেন তাঁর বিভিন্ন গোপন সিদ্ধান্তের শ্রোতা। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের নীরব সাক্ষী ছিলেন। তাঁর নীলাচল যাত্রাপথের অতন্দ্র-সঙ্গী।

শ্রী রাধার যেমন শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ মহাপ্রভু নিজেকে গদাধরের প্রাণনাথ প্রমাণ করতেই শ্রীগদাধরের নিত্য সেবিত গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করেন। মন্দিরের সেই দ্বারদেশ পুনরায় আর সেই শ্রীগৌরচরণ স্পর্শে ধন্য হতে পারেনি।

শচীমাতার সহোদর ভাই শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মামা হওয়ায় সবার কাছে মামু গোস্বামী নামে পরিচিত ছিলেন। গদাধর প্রভুর শিষ্য এই মামু গোস্বামী ছিলেন শ্রী গোপীনাথের পরবর্তী সেবক। শ্রী শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য পরম্পরাগত শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর (ঘন

শ্যামদাস) মহাশয় তাঁর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান সম্পর্কে যা লিখেছেন তা আমরা নিচে উল্লেখ করলাম—

ওহে নরোত্তম! এইখানে গৌরহরি।
না জানি—কি পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি ॥
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়।
তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ-হৃদয় ॥
ন্যাসি-শিরোমণি—চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার?
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার ॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন-পুনঃ না আইলা বাহিরে ॥
প্রভু সঙ্গোপন সময়েতে হৈল যাহা।
লক্ষমুখ হইলেও কহিতে নারি তাহা ॥
এইখানে গোস্বামী হইলা অচেতন।
এথা সব মহান্তের উঠিল ক্রন্দন ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর পুরী দর্শনে গেলে গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এবং ঐ সময়ে গোপীনাথ মন্দিরের প্রধান পুজারি মামু ঠাকুর নরোত্তম ঠাকুরকে উপরোক্ত কথা বলেছিলেন। সুতরাং দেখা যায় ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ অনুযায়ী শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রী গোপীনাথ বিগ্রহে লীন (মিশে) হয়ে যান।

১.১০ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তর্ধানকাল

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানকাল বা সময় সম্পর্কেও বিভিন্ন মত রয়েছে।

১. শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের চৈতন্য মঙ্গলে লেখা আছে আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথি রবিবার তৃতীয় প্রহরে (আনুমানিক বিকেল ৩টা) মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরে অদৃশ্য হয়ে যান।
২. জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ অনুযায়ী আষাঢ় মাসের রথযাত্রার সপ্তম দিনের রাত্রি ১০টায় এই জড়জগৎ ছেড়ে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠে চলে যান।

এখন আমরা পর্যালোচনা করে দেখি এইসব উক্তি কতটুকু নির্ভরযোগ্য। প্রথমেই বিচার করা যাক—

১. রথযাত্রা হয় আষাঢ় মাসে (জুন-জুলাই)। সেই সময় মহাপ্রভুর তিরোধান সম্ভবপর কিনা।

ভক্তিরত্নাকর (অষ্টাদশ শতাব্দী সংস্করণ) গ্রন্থের তৃতীয় তরঙ্গে দেখা যায়—শ্রী শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য নিজের বাসস্থান যাজিগ্রাম থেকে যাত্রা করে শ্রী খণ্ড নিবাসী শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের চরণে উপনীত হয়ে তাঁর কাছে ঐ অভিলাষ ব্যক্ত করেন। ঠাকুর মহাশয়ের আজ্ঞা নিয়ে তিনি মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে নীলাচল পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন—

মাঘ শুক্লা-পঞ্চমী দিবসে শুভক্ষণ।
মনের উল্লাসে শ্রীনিবাসের গমন ॥

তবে নীলাচল যাবার পথেই একসময় সবচেয়ে দুঃখজনক সংবাদ পেলেন যে মহাপ্রভু সঙ্গোপন লীলা করেছেন।

মনের আনন্দে শ্রী নিবাসের গমন।
কত দূরে শুনিল চৈতন্য সঙ্গোপন ॥

ভক্তিরত্নাকর-এর মতো প্রামাণিক গ্রন্থ অনুযায়ী তাই আষাঢ় মাসে (জুন-জুলাই) মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রশ্নই উঠে না। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ থেকে দেখা যায়—

শ্রী অদ্বৈত প্রভুর তর্জ্জা পেয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সহ্য করতে না পেরে মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দের গলা ধরে প্রেম বিকারে উন্মাদের মত আচরণ করতে থাকেন। উক্ত গ্রন্থ থেকে দেখা যায় কোন এক মধ্য রাত্রিতে কোন প্রকারে স্বরূপ দামোদর প্রভুকে বিছানায় শোয়ানো সত্ত্বেও—

বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।
গম্ভীরা ভিতরে নাক ঘষিতে লাগিলা ॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানেন প্রভু পড়ে রক্তধার ॥

প্রভুর এই অবস্থা দেখে সেই রাত্র থেকেই শঙ্কর পণ্ডিত নামের এক ভক্তকে প্রভুর ঘরে শোয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শঙ্কর রাত জাগতে জাগতে ঘুমিয়ে পড়লে "প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়।"

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় শীতকালে মহাপ্রভুর ঘরে শঙ্করকে শোয়ানো হয়েছিল। শঙ্কর ঘুমিয়ে পড়লে মহাপ্রভু নিজের গায়ের শীতের কাঁথাটি জড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ শীতকাল ছাড়া অন্য কোন সময়ে পুরীর মত গ্রীষ্ম প্রধান স্থানে কাঁথা গায়ে দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাহলে মহাপ্রভুর তিরোধান জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের কোন এক সময় হয়েছিল এটা আমরা ধরে নিতে পারি। এই ধারণার সমর্থনে আরও যুক্তি আছে : শ্রী জগদানন্দ প্রতি বছর গোপলীলা হওয়ার পরই নবদ্বীপে শচীমাতাকে দেখতে যেতেন। এই গোপলীলা মহাপ্রভু করতেন নন্দোৎসবের দিন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর পরের দিন। এই উৎসব সাধারণত হয়ে থাকে অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ জগন্নাথের রথযাত্রার প্রায় দুই মাস পর। তাহলে ধরে নেওয়া যায় সেপ্টেম্বরের পরই অক্টোবরের মধ্যেই জগদানন্দ সেই বছর নবদ্বীপে গিয়েছিলেন এবং এক মাস পরই অর্থাৎ নভেম্বর মাসের মধ্যেই পুরী ফিরে এসে অদ্বৈত প্রভুর তর্জ্জা মহাপ্রভুকে জানান। সেটি নিশ্চয়ই ডিসেম্বর-জানুয়ারির মধ্যে হবে এবং তখন শীতকাল। তাহলে মহাপ্রভুর তিরোধান হয়েছিল মাঘ মাসে (ফেব্রুয়ারি)। আগের বর্ণনায় আমরা পেয়েছি শ্রী শ্রীনিবাস আচার্য্য পুরীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছিলেন মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে। যাজি গ্রাম থেকে শ্রীনিবাস প্রভুর পুরী পৌঁছতে ১৫-২০ দিন লাগার কথা।

২. ড. দীনেশচন্দ্র সেন জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলের ভিত্তিতে বলেন যে মহাপ্রভুর তিরোধান হয়েছিল ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই বা আষাঢ় মাসে। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত-এর মত প্রামাণিক গ্রন্থ বিবেচনা করলে স্পষ্টতই বলা যায়, ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে মহাপ্রভু তিরোধান করেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
আটচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দ শত পঞ্চান্নে হৈল অন্তর্দ্ধান ॥

চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন বিলাস॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিলা সন্ন্যাস।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥

(চৈ. চ. আ. ৪৩/৮-৯)

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ৪৮ বছর প্রকট ছিলেন। এর মধ্যে প্রথম ২৪ বছর গৃহাশ্রমে এবং শেষ ২৪ বছর সন্ন্যাসলীলায় ছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অর্থাৎ ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ। তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর তিরোধান ১৪৫৫ শকের মাঘ মাস অথবা ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের আগে নয়। কারণ আগে হলে ৪৮ বছর পূর্ণ হয় না। ড. দীনেশ সেনের মত অনুযায়ী আষাঢ় মাস (জুলাই) ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ ধরলে মহাপ্রভুর প্রকটকাল ৪৮ বছর হয় না। তাই ড. সেন এবং জয়ানন্দের হিসাব মানা সম্ভব নয়।

গৌড় দেশ থেকে ভক্তগণ প্রতিবছর রথযাত্রার সময় কীর্ত্তন-বিশ্রাম ইত্যাদি করতে করতে প্রায় ২০ দিনে নীলাচলে পৌঁছতেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী দিন-রাত পায়ে হেঁটে ১২ দিনে নীলাচলে পৌঁছেছিলেন—একথা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তাই ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তর্ধান মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে হয়েছিল। কারণ শ্রী শ্রীনিবাস আচার্য্য গৌড়দেশ থেকে যাত্রা করে নীলাচলে ২০ দিনের যাত্রাপথের মাঝখানে মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার সংবাদ শুনেছিলেন। তাই মহাপ্রভুর ১৪৫৫ শকাব্দের মাঘ মাসে অন্তর্ধান লীলা করেছিলেন—মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

শ্রীল প্রভুপাদ।

শ্রী শ্রী বঙ্কুবিহারী জিউ মন্দির
২ নং বি কে দাস রোড, শ্যামবাজার, ঢাকা।